দৈনিক সংবাদ

44

তারিখ ... SEP 0 4 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধের উপায়

হোসনে আরা শাহেদ

পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের নকল করা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, সংকট বা সমস্যা হিসেবে বিষয়টি আলাদা কিছু নয়। সমাজের সর্বস্তরে যে দুর্নীতির প্রসার, এ তারই অংশ মাত্র।

এর মানে আবার এ নয় যে পরীক্ষায় দুর্নীতিকে এ কারণে হালকা করে দেখা যাবে। বরং দৃঢ়ভাবে বলা চলে এর ক্ষতিকর প্রভাব সমাজের আর পাঁচটি ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি। এর সঙ্গে সম্পর্ক দেশের শিক্ষার, সম্পর্ক জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকের।

নকল আগের কালে যে হয়নি তা নয়। হয়েছে তবে তা খুব কম। নকলকারী নিন্দিত হতো। নিদারুণভাবে তাকে হেয় হতে হতো। আজকের দিনে নকল করে লজ্জায় পড়তে হয় না। এর পরিধি বাড়ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নকলের কলাকৌশলের বৈচিত্র্য অবাক করে দেয়ার মতো। পত্রপত্রিকায় এসব নিয়ে লেখালেখি হয়েছে বিস্তর, ওয়ার্কশপ- সেমিনারও হচ্ছে প্রচুর। সচেতন অভিভাবক এ নিয়ে উদ্বিগ্ন কিন্তু নকলের অব্যাহত গতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই জ্বলন্ত বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে। প্রতিকার- প্রতিবিধানের জন্য প্রতি বছরই নতুন নতুন উপায়-উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে কিন্তু নকল উপচে উঠছে দিন দিন তার ব্যাপকতায় ও ভয়াবহতায়। নকল কেন করা হয়? আর সব বাদ দিয়ে এই বিশেষ দিকটাই যদি বিশ্লেষণ করি, এই জটিল প্রশ্নের সহজ জবাব একটিই। তা হচ্ছে পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকা। তাহলে ফের প্রশ্ন জাগে, প্রস্তুতি না নিয়ে পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে যায় কেন তবে? যায় তাকে পাস করতে হবে, পাসের সনদ করায়ত্ত করতে হবে। হবে বলেই সে নকলের উপর নির্ভর করে এবং যে কোনও উপায়েই হোক নকল করে।

এখন থেকে একটি প্রশ্ন পরিষ্কার, অপ্রস্তুত পরীক্ষার্থী নকলে আগ্রহী ও ব্রতী। প্রস্তুতি থাকলে কেউ নকলে যায় না। প্রশ্ন উঠে প্রস্তুতি থাকে না কেন? ছাত্রের কাজ অধ্যয়ন। অধীত পাঠ থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি হয়। স্কুল-কলেজে দশ-বারো বছর সে পড়ল কি তবে? জবাব এখানেই। স্কুল-কলেজে সে পড়েনি। তার পড়ার সময় সুযোগ কোনটাই হয়নি - সে ইচ্ছাও জাগেনি। সে শুধু খাতায় নাম রেখেছে বেতন দিয়ে দিয়ে। এটুকুও সে করেছে শিক্ষাবোর্ডে তার নাম রেজিস্ট্রি ফরমের জন্য, তার ফাইনাল পরীক্ষায় ফরম পূরণের জন্য।

শিক্ষার জগতে একটি ক্ষুদ্র পরিসরে আছি, দেখছি স্কুল-কলেজের সমস্যা বাড়ছে, টিনশেড দ্রুত দালান হচ্ছে, জীর্ণ দালান হয়ে যাচ্ছে বিশাল ভবন। বাড়ছে টুল- টেবিল, আসবাব- কেতাব, শিক্ষিতের হারও বাড়ছে। শুধু নামছে শিক্ষার গুণগত মান। শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানার্জনের জন্য আগ্রহ দ্রুত উবে যাচ্ছে। শিক্ষার্থী এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে না। কোচিং সেন্টারের পেছনে ছোটে। কোচিং কেন্দ্রের ভূমিকা এ ব্যাপারে মুখ্য।

হ্যাঁ, কোচিং সেন্টার খুব পুরনো না হলেও হালে এ অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। ছাত্র এখন তার শ্রেণীকক্ষের চাইতে কোচিং সেন্টারকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কোচিং সেন্টারের কাছে নোট সরবরাহ করা এবং পরীক্ষা গ্রহণ করা। বিশদ পাঠ সম্পর্কে কথা নেই, সম্পর্ক নেই মূল পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে, শুধু বাছাই করা নোট এবং তা রেডি করে দেয়া। বাছা বাছা প্রশ্ন আর তার রেডিমেড উত্তর - ছাত্রজীবনের আকর্ষণ কোচিং কেন্দ্রের জন্য তীব্র থেকে তীব্রতর করছে।

অর্থহীন করে তুলছে স্কুল, কলেজ, ক্লাস, টিচার - শ্রমবিমুখ করে তোলা হচ্ছে ছাত্রদের, তারা নিজেরা কাগজ-কলম নিয়ে কষ্ট করতে চায় না আর। কোচিং কেন্দ্রগুলো চটকদার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগুন ছড়াচ্ছে। যত উচ্চমূল্যই হোক সে আগুনে আহুতি দিচ্ছেন অসংখ্য ছাত্র-অভিভাবক। এখানে আমাদের জিজ্ঞাসা- এমন বিজ্ঞপ্তি পত্রিকার পাতায় ঠাঁই হয় কি করে যে বিজ্ঞপ্তি বলে, 'ছাত্রকে শতকরা অত পার্সেন্ট নম্বর পাইয়ে দেয়ার গ্যারান্টি দেয়া হচ্ছে।' 'কিংবা স্টার/স্ট্যান্ডের নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে।' এমন গ্যারান্টির শক্তি কি? উৎস কোথায়? এমন ক্ষতিকর বিজ্ঞপ্তি জাতীয় সংবাদপত্রে কি করে ঠাঁই পায়? আজকের শিক্ষার্থী ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য কি পত্রপত্রিকার কোনও দায়দায়িত্ব থাকতে নেই? বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আছে বর্ণালী প্রাচীরপত্র এবং তা যত্রতত্র। এসবের প্রত্যক্ষ পরিণাম- পাঠ্যঅভ্যাস অন্তর্হিত হওয়া, কষ্ট বা শ্রম করে অনুশীলন বর্জন করা এবং সহজে বাজিমাৎ করার খায়েশ পোষণ করা। সবটাই এখন কড়ি ফেলে তেল মাখার মতো ব্যাপার। আমার দৃষ্টিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এখন পোস্ট অফিসের শুধু নাম রেজিস্ট্রেশন আর ফরম পূরণের মাধ্যম হওয়া। এসব কোচিং কেন্দ্র জমজমাট ব্যবসা কেন্দ্র। এমবিবিএস পাস করেও এখন কোচিং কেন্দ্র খোলার কথা ভাবা যায়, উতলা হওয়া যায় কোচিং সেন্টারের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেও। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েও প্রাথমিকভাবে কোচিং কেন্দ্র খোলার কথা মাথায় আনা সম্ভব। অর্থ-উপার্জনের চমৎকার উপায় এখন কোচিং কেন্দ্র- প্রদীপ্ত তারুণ্য এখন প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এর প্রতি নিবেদিত।

অভিভাবক এখন কোচিং সেন্টারে কিভাবে সন্তানদের ঢোকানো যায়, ব্যগ্র হয়ে চিন্তা করেন। সন্তানও এখন 'ফলপ্রসূ' কোচিং সেন্টার হাতড়ে ফেরে। আমরা দেখেছি- এসএসসি -এইচএসসিতে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত মেধাবী অতি তরুণ ছাত্রছাত্রীরাও কোচিং সেন্টারের চড়াদামের টিচার এবং ফলাও করে চালানো হয় তার প্রচার। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল, বৃহত্তর সমাজ নীরব- যদিও অনেকেই সমালোচক- কিন্তু প্রতিবাদী কেউ নন। এ সম্পর্কে মৌনতা ভয়ঙ্কর হবে। কোচিং কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তার সঠিক রূপরেখা নির্ণয় করার দরকার আছে- দরকার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের। আমরা মনে করি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর কোচিং সেন্টার পাশাপাশি চলতে পারে না, চলতে দেয়া সমীচীন না। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মনের ও দর্শনের অ-শিক্ষক সম্প্রদায়ের হাতে কচি কোমল শিক্ষার্থীদের ছেড়ে দেয়া যায় না।

বিশেষত মাত্র ক'বছর আগেও কোচিংকে নিরুৎসাহিত ও ধিকৃত করা হয়েছে। প্রাইভেট টিউটর বা গৃহশিক্ষকের সিংহভাগ ছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের- টিচার। ক্লাসের পাঠের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা সঙ্গত বলে এ সিদ্ধান্ত আদৃত হয়েছিল সর্বত্র। এখন অবস্থা আরো করুণ।

গৃহ শিক্ষকতাও টিচারের হাতে নেই। কিছুটা সুলভে পাওয়ার জন্য নিরুপায় অভিভাবক এখন কলেজের ছাত্র কি বিভিন্ন অফিসের সাধারণ কর্মচারীকে শিক্ষক হিসেবে গৃহে নিযুক্তি দেন। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পাঠ, পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম, প্রশ্নের ধরন, মান, অর্থাৎ শিক্ষার সর্বাধুনিক তথ্যের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তারা পরিচিত নন বলে তাদেরও কাজ হয় নোট তৈরি করে দেয়া, বই ছাপিয়ে আরও সংক্ষিপ্ত করে দেয়া, প্রশ্ন বাছাই করা অর্থাৎ বিনাশ্রমে পরীক্ষা নামের তরীটি পার করে দেয়ার পথ বাতলে দেয়া। এখানেও শিক্ষার্থী বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা থেকে। অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্ত শিক্ষা তার মনমানসিকতা ও সার্বিক পরিণতি অশুভ পথে নিয়ে যায় টেনে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভাল এ বলা যায় না। বৈষম্য, নানা ধরনের বৈষম্য। সরকারি- অসরকারি এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান তো আছেই তাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান নিয়ে। অসরকাদের মধ্যেও আজ দুস্তর ব্যবধান। অসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেউ কেউ কুলীন। তারা সব নিয়ম-কানুন ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষাবোর্ড থেকে যেসব নিয়মাবলি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। তা সবাই মানতে বাধ্য থাকলেও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান বুঝি বাধ্য থাকে না। সরকারি বিধান- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি একদিন। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাই। কিন্তু 'অভিজাত' প্রতিষ্ঠানগুলোতে সপ্তাহে ছুটি দু'দিন। আবার কলেজে ভর্তির ও ক্লাস আরম্ভের তারিখ নির্ধারিত করে পাঠানো হয়। কিন্তু দেখা যায়, তথাকথিত 'বড়' 'বড়' প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের নিজস্ব নিয়মে আগে ভাগেই তা সেরে ফেলা হয়। অর্থাৎ ভর্তি, ভর্তি পরীক্ষা, ক্লাস শুরু সবই অনেক আগে হয়ে যায়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ, ভর্তি পরীক্ষা লিখিত হতে হবে কিন্তু মাত্র দু'দিন আগেও দেখা গেছে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন, এ জিজ্ঞাসা জাগে। এ অন্তর্জ্বালা নয়, এর মাধ্যমে এমন অনিয়মের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে শত সংকট যা সংকটই বাড়িয়ে চলেছে নানাভাবে। এতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে দেখা দিচ্ছে হীনম্মন্যতা, অভিভাবকের মধ্যে দেখা দিচ্ছে অনীহা ও অশ্রদ্ধা। অমুক অমুক স্কুল কলেজ এতসব করেছে- তোমরা পারছ না কেন? পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে উঠে। আমাদের দুঃখ, চুনোপুঁটির দল কি চিরটা কাল ঘোলা জলেই খাবি খাবে?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন বিভেদ সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী বোর্ডের ফলাফল। মেধা তালিকায় স্থান পায় মেট্রো সিটির কয়েকটি মাত্র কলেজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। শহরতলি থেকে আর যায় না, গণ্ড-গাঁ থেকে তো নাই। এর কারণ খুঁজতে হবে। অতি ভাল ছাত্র ভর্তি করে অতি ভাল ফল করে যশ সুখ্যাতি আহরণের তাৎপর্য কতটা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ কারণেই আরেকটি বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে- তা হচ্ছে শহরের ও গ্রামের।

বলা হয়, গাঁ থেকে যা, তা-ই গেঁয়ো। আমরা ভুলে কি যেতে পারি, মাত্র পাঁচ দশক আগেও গ্রামের অত্যাশ্চর্য দ্যুতি? আজ যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে, ঠিক তারা না হলেও তাদের দু'ধাপ আগে যারা ছিলেন, যারা অবসরে গেছেন, তাদের স্কুল-জীবন গ্রামেরই জীবন। তাদের ঘাটতি কোথায়- লেখায়, ভাষায়, জ্ঞানে, অভিজ্ঞানে? কেন আজ গ্রামে এমন? সর্বতোভাবে শিক্ষার বঞ্চনার এবং হতাশার তারপর তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার।

অতসব ব্যবধান বৈষম্য বঞ্চনা নিয়ে আমাদের শিক্ষার রাজ্য। মাত্র গুটিকতকের ঔজ্জ্বল্যে আমরা দীপ্যমান- বৃহৎ অংশ অবজ্ঞায়, অবহেলায় ভাসমান। দেশের সম্পদ তারাও, তারাও ভবিষ্যৎ জাতির। তাদেরও আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, আছে মানবিক অনুভূতি। এদের দিকে পিঠ দিয়ে আছে বলেই তারা আজ ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছে; সকলে নয়। অনেকে চাতুর্যের শিকার হচ্ছে- অনেকে ডুবে যাচ্ছে।

বলিষ্ঠ নীতি ও তার প্রয়োগের বড় প্রয়োজন এবং তা সর্বত্র সমানভাবে। এখানে আমি-তুমি নেই, থাকতে পারে না সে বা ও সবাই দেশের নাগরিক। কানুন সবার জন্য সমান? প্রতিযোগিতা হবে এবং তা সুষ্ঠুভাবে। কোন প্রতিষ্ঠানে ক'জন 'স্ট্যান্ড' করল, কতজন 'স্টার' পেল তা দিয়েই মান নির্ণয় শুভ পন্থা নয়। ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে মেধার বিভাজন ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না আর মেধা এমন বস্তু নয় যে, তাকে চিরে চিরে যাচাই করা যাবে। এর মূল্যায়ন হবে 'সমগ্রের' নিরিখে, সামগ্রিকভাবে। এ সমগ্রকে স্পর্শ করতে হলে অখণ্ড পদ্ধতি ও পন্থা আবশ্যক- শত ব্যবধানের মধ্য দিয়ে তা লভ্য নয়।

প্রশ্ন ওঠে এমনি হাজারো। নকল কি ও কেন? নকল বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এও সমগ্রের খণ্ডিত ফসল। একে হটাতে হলে সকলকে সব সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে শাসন অনুশাসন, নিয়ম কানুনও সর্বত্র সমান হতে হবে- সরকারি- অসরকারি, অভিজাত, অনভিজাত, ছোট-বড়, ছেলেমেয়ে, মেট্রোসিটি-শহরতলি, শহর-গ্রাম।

শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাকে বাঁচাতে হবে হাজারো জুজুবুড়ির হাত থেকে। বাঁচাতে হবে ছাত্র রাজনীতি, কোচিং কেন্দ্রসহ সব ধরনের বৈষম্য থেকে। এজন্য আমি সবিনয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি- আপনারা ছাত্রদের ক্লাস রুমে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ক্লাসে ছাত্রকে যেতেই হবে। এ নির্দেশ প্রচার মাধ্যমে ও পত্রপত্রিকায় প্রচার ও প্রকাশের উদ্যোগ নিন। তাহলে সংশ্লিষ্ট সকল মহলে সচেতনতা আসবে। স্কুল কলেজেও প্রাণ ফিরে আসবে। সব ধরনের অনিয়ম দূর হবে।

যা নীতি বিগর্হিত। তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয় না। শুভবুদ্ধির দ্বারা, শুভ প্রয়াসের দ্বারা অশুভকে বিতাড়িত করা সম্ভব। আমরা ছাত্রদেরকে রেস্তরাঁয়, রাজনীতির অঙ্গনে, কোচিং সেন্টারে দেখতে চাই না। তাদের স্থান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর পাঠাগার।

সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, নকলের কারণ অন্বেষণে কোনও ধরনের যন্ত্রের অবিষ্কারের দরকার নেই, এ সহজ অংক। এ অংক মিলে যাবে তাড়াতাড়ি, যদি, সমস্যাগুলো ঠিকভাবে সাজানো যায়। আপনারা আমাদের ছাত্রদের আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন-তাদের অশিক্ষক সম্প্রদায়ের হাত থেকে বাঁচান। বাঁচান পরিবেশের ঝঞ্ঝা-ঝঞ্ঝাট থেকে। সেই সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষককে শিক্ষাঙ্গনে ধরে রাখার উদ্যোগ নিন- তারা যেন বাধ্য না হন শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন ছেড়ে আর কোথাও যেতে। অসহায়তা বা প্রলোভন যেন তাদের শিক্ষক সত্তাকে পরাভূত করে অন্য মানুষে পরিণত না করে।